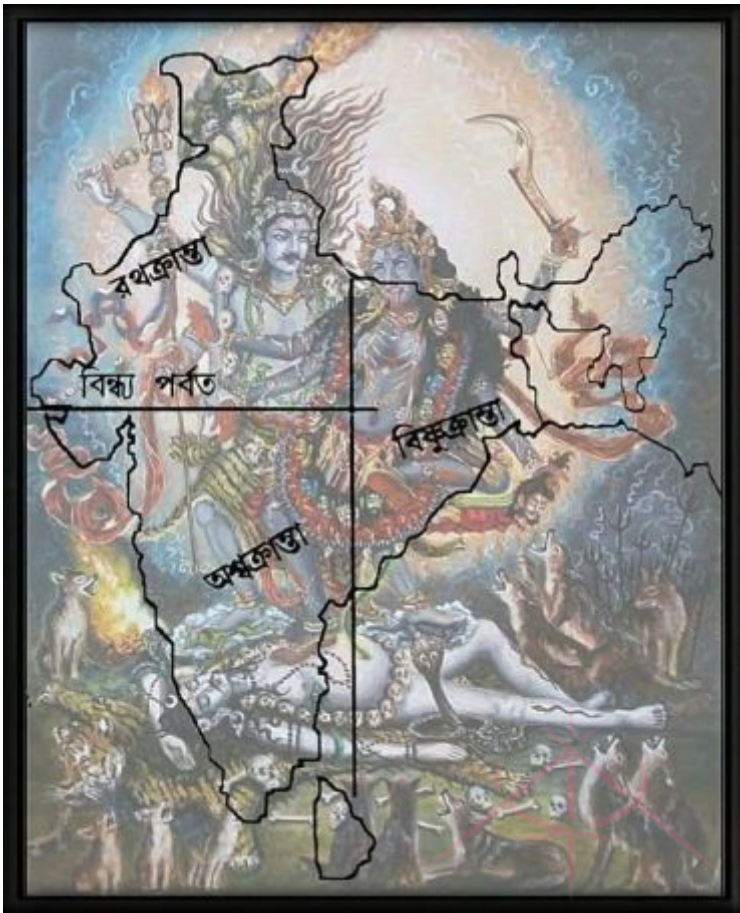




194 খানি তনু তর শাস্ত্রের প্রকারভেদে

194 খানি তনু তর শাস্ত্রেরে প্রকারভেদে ~ ~

তত্ত্বানুসারে ভারতবর্ষ তনিভাগে বিভক্ত। বন্ধ্যাচল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত
প্রদশে বষ্ণুক্ৰান্তা, বন্ধ্যাচল থেকে কন্ধ্যাকুমারিকা পর্যন্ত অশ্বক্ৰান্তা বা
গজক্ৰান্তা এবং বন্ধ্যাচল থেকে নেপোল, মহাচীন কাশ্মীর প্রভৃতি দশে রথক্ৰান্তা
নামে বখ্য়াত। প্রত্যকে ক্ৰান্তায় 64 খানকিরে 192 খানতিন্ত্র সমগ্র ভারতে
প্রচলতি রয়েছে।

তান্ত্রিকি ঐতহিযে তনিটি স্রোত স্বীকৃত হয়— দক্ষিণি, বাম ও মধ্যম। দক্ষিণি স্রোতেরে অন্তর্গত তন্ত্রসমূহেরে নাম যোগিনীজাল, যোগিনীহৃদয়, মন্ত্রমালিনী, অঘোরেশী, অঘোরেশ্বরী, করীড়াঘোরেশ্বরী, লাকনিকল্প, মারচী, মহামারচী ও উগ্রবদ্বিযাগণ। মধ্যম স্রোতেরে অন্তর্গত তন্ত্রসমূহ হচ্ছে বজ্রিয়, নশ্বিবাস, স্বায়ম্ভুব, বাতুল, বীরভদ্র, রটোরব, মাকুট ও বীরশে। বাম স্রোতেরে তন্ত্র হচ্ছে চন্দ্রজ্ঞান, বশ্বি, প্রোদগীত, ললতি, সিদ্ধি, সন্তান, সর্বোদগীত, করিণ ও পরমশেবর। ব্রহ্মযামলরে পরশিষিট পঙ্কিগলামতে দু'ধরনের তন্ত্রেরে উল্লেখ আছে, কামরূপী ও উড্ডিয়ানী। অপর একটি পরশিষিট জয়দ্রথযামলে তনি ধরনের মহাযোগী তন্ত্রেরে উল্লেখ আছে যথা মঙ্কলাষ্টক, চক্রাষ্টক ও শখিাষ্টক। মহাসিদ্ধিসার তনতরে ভারতবরষকে তনিটি ভৌগোলিকি ভাগে ভাগ করা হয়ছে— বশ্বিকুরানতা,

রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা, প্রতটি অঞ্চলে চট্টাটটি করে তন্ত্র বর্তমান। শক্‌তসিদ্ধগমতন্ত্রের মতে বন্ধি থকে যবদ্বীপ পর্যন্ত এলাকা বন্ধিক্রান্তা, উত্তরে বন্ধি থকে মহাচীন পর্যন্ত রথক্রান্তা এবং পশ্চিমেরে অবশিষ্ট অংশ অশ্বক্রান্তা। ষট্‌সম্ভবরহস্যে চারটি তন্ত্র সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে— গট্টা, করেল, কাশ্মীর ও বলিাস। বাস্তবে মোটামুটি তিনটি তান্ত্রিক সম্প্রদায় স্বীকৃত— গট্টীয়, কাশ্মীরীয় এবং দ্রাবড়ীয়।

কাশ্মীর শৈববাদে গ্রন্থসমূহ কাশ্মীরীয় তন্ত্রের অন্তর্গত। অনুরূপভাবে শৈব সিদ্ধান্তীদে রচনাসমূহ দ্রাবড়ীয় তন্ত্রের অন্তর্গত।... গট্টীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থসমূহের মধ্যে কট্টালবলী, গান্ধর্ব, কুলার্ব, ফৎকারগী, সনৎকুমার, মহাচীনাচার, কামাখ্যা, গুপ্তসাধন, মাতৃকাভদে, তারারহস্য, গায়ত্রী, গট্টামীয়, মহানর্বিবাণ, শ্যামারহস্য, ত্রপিরাসারসমুচ্চয়, উড্ডামশ্বেব, নরিত্তর, কামধেনু, কঙ্কালমালিনী, নীলতন্ত্র, নর্বিবাণ, বৃহন্নীল, বৃদ্রযামল, যোগিনী, যোগিনীহৃদয়, তন্ত্ররাজ, প্রভৃতি জয়দ্রথতন্ত্রলোকে (১/১৮) কথিত হয়েছে যে শিবের যোগিনী মুখ হতে চট্টাটটি ভৈব আগম নর্গত হয়েছিল যোগলি অদ্বৈতপন্থী ছিল। এ ভিন্ন দশটি দ্বৈতপন্থী শৈব আগম এবং আঠারটি মিশ্র মতবাদে রট্টার আগম বর্তমান ছিল। শঙ্করের উপর আরোপিত সট্টন্দরযলহরীতে (৫/৩৭) চট্টাটটি তন্ত্রের উল্লেখ আছে, যোগলির নামের তালিকা লক্ষ্মীধরের ভাষ্যে দেওয়া আছে।

তন্ত্রাচার ‘চীনাচার’ নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ঠ চীন বা মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই-সকল কবিদন্তীও আমাদের অনুমানেরই পরপিষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলি কাশ্মীরে রচিত; ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু তন্ত্র রচিত হইলেও বঙ্ক-কামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তন্ত্রের রচনাস্থান— নপোল-ভূটান-তব্বিত-অঞ্চলে এগুলি বহুল প্রচার এবং অধ্যাবধি সংরক্ষণ। ইহা ব্যতীতও পার্শ্বপ্রমাণরূপে আমরা আরো কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতে পারি।

তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষট্‌চক্রের পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ; নম্নতম মূলধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া ভ্রুমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই ষট্‌চক্র। এই ছয়টি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিয়াছেন— নম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া এই দেবীগণ যথাক্রমে হইলেন ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। এই নামগুলি প্রতিলক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝা যায় এই নামগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই, ‘ডাক’ কথাটি তব্বিতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী। আমাদের ‘ডাক ও খনার বচন’ের ডাকের বচন কথার মূল অর্থ বোধহয় জ্ঞানীর বচন। ডাকিনী কথার মূল অর্থ বোধহয় ছিল ‘গুহ্যজ্ঞানসম্পন্ন’; আমাদের বাঙলা ‘ডাইনী’ কথার মধ্যে তাহার রশে আছে; মধ্যযুগের নাথসাহিত্যের রাজা গোপীচাঁদে মাতা ময়নামতী ‘মহাজ্ঞান’সম্পন্ন এই-জাতীয় ‘ডাইনী’ ছিলেন। সুতরাং মনে হয়, এই ‘ডাকিনী’ দেবী কোনও নগুটজ্ঞানসম্পন্ন তব্বিতী দেবী হইবেন। ‘লাকিনী’ ও ‘হাকিনী’ নামে ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনও দেবীর উল্লেখ পাইতছি না, কিন্তু ভূটানে ‘লাকিনী’ ও ‘হাকিনী’ দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতছে। তাহা হইলে তব্বিত-নপোল-ভূটান-অঞ্চলে অঞ্চলিক দেবীরাই কিতন্ত্রের ষট্‌চক্রের মধ্যে আপন আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন?’

‘এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্যের প্রতিপত্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রের অতিশয় প্রাধান্য। এই মন্ত্রতত্ত্বের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। কিন্তু সেই-সকল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে অশ্রদ্ধা না করিয়াও কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তন্ত্রের মন্ত্রসমূহের

মধ্যে আমরা বীজমন্ত্রের নানাভাবে উল্লেখ দেখতে পাই। এই বীজমন্ত্রগুলি সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী বীজমন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রণব বা ‘ওঁ’ সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র। অন্য মন্ত্রগুলি বৈদিক বলিয়া মনে হয় না। হ্রীং ক্লীং হ্রীং ক্রীং প্রভৃতি মন্ত্র মূলতঃ সংস্কৃত ভাষাজাত ক-না এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে। এই বীজমন্ত্র ব্যতীত তন্ত্রের মধ্যে আমরা আর-এক রকমের মন্ত্রমালা পাই, এই মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ দ্বিমিত্রকি— ইহাদের কোনও অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। মহাযানী বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ একস্থানে বলিয়াছেন যে, এই অর্থহীনতাই ইহাদের যথার্থ তাৎপর্য। অবশ্য অর্থহীন মন্ত্র অর্থবাদি বৈদেয় মধ্যেও পাওয়া যায়। তন্ত্রে যে একাক্ষরী বীজমন্ত্রের এবং দ্ব্যক্ষরী মন্ত্রমালার বহুল ব্যবহার পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে এমন কথা মনে করা কি একান্ত ভ্রমাত্মক হইবে যে, এগুলি আমাদের পূর্ববর্ত্ত তান্ত্রিক অঞ্চলের কোনও প্রাচীনকালে প্রচলিত ভাষার লুপ্তাবশেষ? আমরা সাধারণভাবে যাহাকে চীনাঞ্চল বা মহাচীনাঞ্চল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছি সেখানকার ভাষায় একাক্ষরতিব বা দ্ব্যক্ষরতিবের প্রাধান্যের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে।’- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য)

তন্ত্রসংস্কৃতি লক্ষণঃ। সরগশ্চ প্রতসির্গশ্চ তন্ত্রনরিণয় এব চ।। দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনং। তথৈবোশ্রমধর্মশ্চ বপিরসংস্থানমবে চ। সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নরিণয়ঃ। উৎপত্তিবিধিানাঞ্চতরুণাং কল্পসংজ্ঞাতিং।। সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমবে চ। কৌষস্ব কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরভাষণং।। শট্টাচাশট্টাচ কথনং নরকাণাঞ্চ বর্ণনং। হরচক্রস্ব চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণং।। রাজধর্মমানে দানধর্মমো যুগধর্মমস্তথৈব চ। ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনং।। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমতিব্যবহৃত্যে।- (বৃহৎতন্ত্রসারঃ)

ভাবার্থ :

সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকরণ, তন্ত্র নরিণয়, দেবতা সংস্থান, তীর্থবর্ণন, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম ধর্ম, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্তব্যাকর্তব্য, পুরাণসংস্থান, পুরাণকথন, কৌষকথন, ব্রতবর্ণন, শট্টাচাশট্টাচ কথন, নরক বর্ণন, হরচক্র কথন, স্ত্রীপুরুষ লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আত্মনরিণয় ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহাকে তন্ত্র শাস্ত্র বলে।

সদাশবিরে পাঁচটি মুখ থেকে পাঁচপ্রকার তন্ত্রের উদ্ভব। পূর্ব মুখের নাম ‘সদ্যোজাত’। এই মুখ থেকে প্রকাশিত তন্ত্রগুলি ‘পূর্বাম্ণায়’ নামে খ্যাত। দক্ষিণ মুখের নাম ‘অঘোর’। এই মুখ থেকে নিঃসৃত তন্ত্রগুলির নাম ‘দক্ষিণাম্ণায়’। পশ্চিম মুখের নাম ‘তৎপুরুষ’। এই মুখ থেকে প্রকাশিত তন্ত্রসমূহের নাম ‘পশ্চিমাম্ণায়’। ‘বামদেব’ নামক উত্তর মুখ থেকে উদ্ভূত তন্ত্রগুলিকে ‘উত্তরাম্ণায়’ বলে। উর্ধ্ব মুখের নাম ‘ঈশান’। এই মুখ থেকে বিনির্গত তন্ত্রসমূহের নাম ‘উর্ধ্বাম্ণায়’।

সদাশবি ও পার্বতী অভিনি। সদাশবি তন্ত্রের উপদেশে পার্বতীর সংশয় ভঞ্জন করছেন। কোন কোন স্থলে জিজ্ঞাসু মহাদেবকে পার্বতী উপদেশে দিয়েছেন।

যেক্ষেত্রে বক্তা শবি এবং শ্রোতা পার্বতী, সেগুলিকে বলে আগম। আর যেক্ষেত্রে বক্তা গরিজা এবং শ্রোতা শবি, সেগুলো নগিম।

আবার তান্ত্রিক গ্রন্থকারদের কউে কউে বলে থাকেন, দক্ষিণাচারের সাধনশাস্ত্রের নাম আগম এবং বামাচার-সম্প্রদায়ের সাধনশাস্ত্রের নাম নগিম।

বৃহৎতন্ত্রসার গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা তন্ত্রের এক দীর্ঘ তালিকা পাই, যমেন—

সদ্বিশ্বেশ্বর তন্ত্র, মহাতন্ত্র, কালীতন্ত্র, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, নীলতন্ত্র, ফৎকারিণী, দেব্যাগম, উত্তরা, শ্রীক্ৰম, সদ্বিজামল, মৎস্যসূক্ত, সদ্বিসার, সদ্বিসারস্বত, বারাহী, যোগিনী, গণেশবহির্ষণী, নতিযাতন্ত্র, শিবিগম, চামুণ্ডা, মুণ্ডমালা, হংসমাহেশ্বর, নরিত্তর, কুলপ্রকাশ, কল্প, গান্ধর্ব্ব, ক্রিয়াসার, নবিন্দ, সম্মোহন, তন্ত্ররাজ, ললতিখ্য, রাধা, মালিনী, রুদ্রযামল, বৃহৎশ্রীক্ৰম, গবাক্ষ, সুকুমুদিনী, বশিষ্ঠেশ্বর, মালিনী, বজ্রিয়, সময়াচার, ভৈরবী, যোগিনীহৃদয়, ভৈরব, সনৎকুমার, যোনতিন্ত্র, নবরত্নেশ্বর, কুলচুড়ামণি, ভাবচুড়ামণি, দেবপ্রকাশ, কামাখ্যা, কামধেনু, কুমারী, ভূতডামর, মালিনীবজ্রিয়, যামল, ব্রহ্মযামল, বশ্বিসার, মহাকাল, কুলামৃত, কুলোডডীশ, কুব্জিকা, তন্ত্রচন্ডিতামণি, মহাষ্মরদ্দিনী, মাতৃকা, মহানর্িব্বাণ, মহানীল, মহাকালসংহতি, মরু, ডামর, বীরভদ্র, বজ্রিয়চন্ডিতামণি, একজটিকা, নর্িব্বাণ, ত্রপুঁরা, কালীবলিাস, বরদা, বাসুদেবেরহস্য, বৃহৎগটোতমীয়, বর্ণগোদুত, বশ্বিগুজামল, বৃহন্নীল, বৃহৎযোনি, রহস্য, ব্রহ্মজ্ঞান, বামকেশ্বর, ব্রহ্মযামল, অদ্বৈত, বর্ণবলিাস, পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, রসোল্লাস, পঞ্চদশী, পচ্ছলি, পূর্ণপঞ্চসার, পরমেশ্বর, হংসাদ্য, নবরত্নেশ্বর, নতি, লীল, নারায়ণী, নারদীয়, নাগার্জ্জ্জন, দক্ষিণামূর্ত্তি, সংহতি, দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, যক্ষিণী, যোগসারার্ণব, অনুত্তম, যোগেশ্বর, যামলভৈরব, রাজরাজেশ্বরী, রবেতী, রামার্চচন্দ্রিকা, স্ববোদয়, ইন্দ্রজাল, কালীতন্ত্র, কালীকুলসর্ব্বস্ব, কুমারী, ককলাশদীপিকা, কঙ্কালমালিনী, কালোত্তর, কুব্জিকা, কুলার্ণব, কল্পসূত্র, গটৌরীতন্ত্র, গন্ধর্ব্বতন্ত্র, শ্রীগণেশ, বহির্ষণী, গুরুতন্ত্র, গায়ত্রী, গবাক্ষ, গবাক্ষসংহতি, জ্ঞানভাষ্য, অন্নদাকল্প, উৎপত্তি, উত্তর, উড্ডীশ, যক্ষডামর, সরস্বতী, শারদা, শক্তসিগ্গম, আগমসর্ব্বস্ব, চীনাচার, তারারহস্য, শ্রীশ্যামারহস্য, স্কন্দযামল, নগিমকল্পদ্রুম, লতা, লতাসার, উর্দ্ধাম্নার। সন্ধোকৃত, কাপলি, অদ্বুত, জমৈনী, বশ্বিষ্ঠ, কপলি, নারদ, গর্গ, পুলস্ত, ভার্গব, সদ্বি, যাজ্ঞবল্ক, ভৃগু, শূক্ৰ, বৃহস্পতি ইত্যাদি।

তবে তন্ত্রের বশিষে অর্থানুযায়ী তাকে বদেবহিত ক্রিয়াদিথেকে পৃথক বুদ্ধিতে হব, এবং যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দেববর্গের পূজাদি তান্ত্রিক ধর্মাচরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর উপাসনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ-সকল দেবতাকে আশ্রয় করে যে-সকল ধর্মাচারকর্ম উদ্ভূত হয়, সেগুলোকে ন্যায়ত অবৈদিক পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ইত্যাদি পূজাক্রম শাক্ত পূজাক্রমের মতো তান্ত্রিক পর্যায়ে বলাই বিবেচনা করা যতে পারে। কিছু সংগৃহীত পাঞ্চরাতর গ্রন্থাবলীর তালিকায় তন্ত্রসাগর, পাদ্মসংহিতাতন্ত্র, পাদ্মতন্ত্র, লক্ষ্মীতন্ত্র প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এভাবে সৌর ও গাণপত্য ধর্মমত সংক্রান্ত কোনও কোনও গ্রন্থ তন্ত্র নামে অভিহিত হতে পারে।

তিনি শঙ্কর আগমাচার্য নামে সমধিক প্রসদ্বি। তাঁর অন্যান্য রচনা হলো শিবির্চনমহারত্ন, শবৈরত্ন, কুলমুলাবতার, ক্রমস্তব প্রভৃতি। মন্ত্রমহোদধির রচয়িতা যে মহীধর তা উক্ত গ্রন্থের মধ্যেই স্পষ্টভাষায় লিখিত আছে। ‘মন্ত্রমহোদধি’ ন্যূনাধিক দ্বাবিংশ তরঙ্গে বভিক্ত, এবং ইহাতে তান্ত্রিক ধর্মাচরণ সংক্রান্ত বহু তথ্য লপিবিদ্ব আছে। ইহার প্রথম তরঙ্গে একটি শ্লোকে পঞ্চচোপাসনার কথা এইরূপ ভাবে লিখিত দেখা যায়— বশ্বিগুশিবিগণেশোর্কো দূর্গা পঞ্চটৈ দেবতাঃ। আরাধ্যাঃ সদ্বিক্রিমনে তন্ত্রমন্ত্ররৈযথোদতিম্ ।। অন্যান্য পটলে গণেশ মন্ত্র, কালীসুমুখী মন্ত্র, তারা মন্ত্র, ছিন্নমস্তাদিকথন, শ্যামা মন্ত্র, মহাপূর্ণা মন্ত্র, ষট্কার্মাদি নর্িব্বপণ, হনুমন্মন্ত্র, বশ্বিগু, শিবি,

কার্তবীর্যাদিমন্ত্র নরীপণ, এবং স্নান, পূজা, পবিত্রার্চন, মন্ত্রশোধন, সুন্দরী (ষোড়শী) পূজন ইত্যাদি নানাবধি বিষয়ে অবতারণা করা হইয়াছে। মহাতন্ত্র নামে অভিহিত মৎস্যসূক্ত মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত হলায়ুধ মশ্রির রচনা। ইহা চতুঃষষ্টি পটলে বিভক্ত একটি প্রামাণিক তান্ত্রিক গ্রন্থ। ইহাতেও নানাবধি তান্ত্রিক ধর্মাচরণের কথা আছে, এবং মহীধর প্রণীত মন্ত্রমহোদধিতে যমেন দশমহাবিদ্যার কালী, তারা, ষোড়শী ও ছিন্নমস্তার নাম পাওয়া যায়, তমেন মৎস্যসূক্তের ষষ্টিম পটলে আর একটি মহাবিদ্যা মাতঙ্গিনীর (মাতঙ্গী) নামের উল্লেখ আছে। এই পটলে মাতঙ্গিনীবিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের একষষ্টিম পটলের বিষয়বস্তু হইতছে সর্বগ্রহনবারিণী মহাবিদ্যা সংক্রান্ত; কনিতু ইহাতে দশমহাবিদ্যার অন্য নামগুলি পাওয়া যায় না। পরবর্তীর পটলে অপরাজিতার নাম আছে, এবং গ্রন্থের অন্যত্র ছয়টি মাতৃকা ও তাঁহাদের স্থানের কথা আছে, যথা— ব্রহ্মাণী (শরিতে), মাহেশ্বরী (নেত্রে), কটোমারী (কর্ণে), বারাহী (উদরে), ইন্দ্রাণী (নাভিতে) এবং চামুণ্ডা (গুহ্যে); ইহা লক্ষ্য করবার বিষয় যে এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবীর নাম করা হয় নাই।...

‘এই বিশাল সাহিত্যের কোনও কোনও অংশের সহিত ভারতীয় অনার্য ও তথাকথিত নমিন্শ্রণীর লোকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলিয়া কহে কহে মনে করেন, কারণ এগুলি অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত, এবং ইহাদের বিষয়বস্তু নমিন্শ্রণীর যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পশ্চিমাম্ণায়ের অন্তর্গত কুব্জকামত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ভলেক (ভলেকী) বা নমিন্শ্রণীর যাদুবিদ্যায় অশেষ পারদর্শিতা অর্জনই এইসব তান্ত্রিক উপাসকের পরম লক্ষ্য ছিল, এবং যাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতেন তাঁহাদগিকে নাথ বলা হইত; নাথপন্থীরা সমাজের নমিন্শ্রণীর লোক ছিলেন, ও এ কারণেই ইহাদগিরে দ্বারা রচিত তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের সংস্কৃত ভাষা অশুদ্ধ, ব্যাকরণবহির্ভূত ও দুর্বোধ্য ছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে লখিত জয়দ্রথ্যামল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে ইহার বিষয়বস্তু সাধারণতঃ কুলার্ণব তন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহাতে লখিত আছে যে পরশবরী দেবীর পূজা হয় কুম্ভকারের নয় কলুর গৃহে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ইহারা হিন্দুসমাজের নমিন্শ্রণীর অবস্থিতি।